INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 3, MARCH 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

তারাশঙ্করের নির্বাচিত রচনায় বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের প্রতিফলন।

গবেষক – শ্রী চন্দন মণ্ডল বাংলা বিভাগ

সোনাদেবী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব সিংভূম ঝাড়খণ্ড

Abstract-

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ করে তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোট গল্পে বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকদের অভিমত একজন কথাসাহিত্যিক যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি তিনি কি ভাবে ওই শতাব্দীতে ধর্মীয় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হলেন। তাঁর রচনায় ওই বিশেষ ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে কথাসাহিত্যের যে বিশেষ ধর্ম সমকালীন সমাজের তথা মানুষের সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সেগুলিকে অস্বীকার করেন নি তো ? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের ওই সকল রচনা গুলির যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বিশেষ মতাদর্শের প্রভাব কথাসাহিত্যিকের ভাবনাকে ভারাক্রান্ত করেছে আদতে তা কিন্তু নয়। কারন তারাশঙ্করের মতো মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত একজন মানুষের কাছে তাঁর চারপাশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যারা পেশা, নেশা, ধর্ম, কর্ম, বর্ণ, জাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের সংস্কৃতি জীবন-যাপন খাদ্যাভ্যাস পূজাপার্বণ ধর্ম-চর্চা উপাস্য উপাসক কোন কিছুই তিনি অস্বীকার করেন নি। বরং অত্যন্ত দরদের সঙ্গে সেই সকল মানুষের সুখ দুঃখের সাক্ষী হয়েছেন। তাঁর ফলস্বরুপ তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের নিদর্শনগুলি হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী। বৈষ্ণব ধর্মের এই প্রভাবের মধ্যে রয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিফলন ,পরকীয়া প্রেমতত্ব ,স্বকীয়া প্রেমতত্ত্ব ,লীলাশুক, পূর্বরাগ, অনুরাগ সবকিছুই যা অত্যন্ত ভক্তি বিগলিত চিত্তের সঙ্গে তিনি পরিবেশন করেছেন। এই প্রবন্ধে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের সেই ধর্মচেতনার উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Keyword – বৈষ্ণব, সংস্কৃতি, পরকীয়া, প্রেমতত্ত্ব, স্বকীয়া, লীলাশুক।

Discussion- কবি কুলতিলক জয়দেব সরস্বতী সেই কবে বলেছিলেন–‘যদি হরিস্বরণে সরসং মনো’,’যদি বিলাস কলাসুকুতুহম’। প্রথম প্রসঙ্গটি যুক্ত ভক্তি – সাধনার সঙ্গে এবং দ্বিতীয়টি সত্য ও সমাদৃত অবৈষ্ণব রসিকের কাছে । দ্বিতীয় কারনের জন্য বৈষ্ণব পদাবলী বা মহাজন পদাবলী আজও কাব্য রস পিপাসুদের কাছে সমান ভাবে আদরণীয় ।আর একালের অবৈষ্ণব পাঠক খুজে পেয়েছেন মানবপ্রেম ও মানব সম্পর্কের রুপ ও রসমাধুর্য। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের বেশ কিছু নিদর্শনের মধ্যে অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির তাঁর বৈষ্ণবীয় ভাবধারার নবরুপায়ন ও নবনির্মাণ লক্ষ্য করি।তারাশঙ্করের সকল রচনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মাত্র কিছু রচনাকে এই আলোচনায় অবতারনা করা হয়েছে। যে গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘রসকলি’ ,’রাইকমল’, ‘রাধা’ সহ বিভিন্নও উপন্যাসে।এবার দেখে নেওয়া যাক তারাশঙ্করের ওই সকল রচনার মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার অনুকরন কি ভাবে হয়েছে, বা রচনা সমুহের কাহিনীর মধ্যে কিভাবে বৈষ্ণবীয় চেতনা প্রভাব বিস্তার করেছে ।

কবি জয়দেব তাঁর ‘গীতগোবিন্দম’ কাব্যে প্রথম ‘পদাবলী’ শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন পদসমুহকে বোঝাতে তিনি বলেছিলেন ‘মধুর কমলকান্ত পদাবলী’।পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পদাবলী শব্দটির সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কিত হয়ে উঠেন যার একদিকে রয়েছে কবিতাগুলির মধ্যে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ভক্তি ভাবনার প্রতিফলন তাদের সাধন প্রণালী অন্যদিকে রয়েছে ভক্তিভাব যুক্ত গানগুলির লিরিক ধর্মীতা। এই দুইয়ের মিশ্রণে গান গুলির জনপ্রিয়তা আজ ও অমলিন ।

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এই আট ধরনের স্থায়ীভাবের কথা বলা হয়েছে। এই সকল স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করে আটটি রসের সৃষ্টি হয়েছে খরবর্তীকালে 'শম' নামক আর একপ্রকার স্থায়ী ভাবের সংযোগে 'শান্ত' রসের উদ্ভব হয়, সেই সময় থেকে স্থায়ীভাবে হয় ন'টি এবং রসও হয় ন'টি।এই সকল ভাব গুলির প্রধান ভাব 'রতি', এবং তার অনুসারী রস হল শৃঙ্গার বা মধুর । বৈষ্ণব মতে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তদের যে অনুরাগ সেই রতির নাম কৃষ্ণরতি, আর সেই রতির রস হচ্ছে 'প্রেম-ভক্তি রস'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রতি পাঁচ ধরনের এবং তার রসও পাঁচ ধরনের।বৈষ্ণব রস শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার রস হচ্ছে-শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর রসে ভক্ত কান্তা, ভক্ত মাত্রই নারী, ভগবান কান্তরূপে বিরাজ করেন। প্রথম চারটি রসে কৃষ্ণের সাধনার প্রকার হল-ভগবানকে সর্বশক্তিমান রূপে মেনে নিয়ে তার চরণে অসহায় আত্মনিবেদন, দাস্য রসে প্রভু রূপে ভজনা, সখ্য রসে সখা ভাবে ভজনা , বাৎসল্য রসে সন্তান ভাবে ভজনা। পূর্ববর্তী চারটি রসের সাধন পদ্ধতির সঙ্গে মধুরকোমলকান্ত ভাব-এই পাঁচটির গভীর এবং আতিশয্যময় মিলনে মধুর রসের উৎপত্তি।এর স্থায়ীভাব 'মধুরা' নামে রতি। 'মধুরা' রতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় সেগুলি হল -- (১) সাধারণী, (২) সমঞ্জসা এবং (৩) সমর্থা।

শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনের পর যখন ভক্তের মনে তার সান্নিধ্য ও সঙ্গলাভের ইচ্ছা জাগ্রত হলে তাকে বলে 'সাধারণী'। শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন শুনে ভক্তের মনে শাস্ত্রসম্মতভাবে তাকে বিবাহের দ্বারা সঙ্গ সুখ লাভের যে বাসনা ভক্তচিত্তে উদ্বুদ্ধ হয় তাকে বলে 'সমঞ্জসা'। আর যার প্রভাবে ভগবান ভক্তের বশীভূত হন তাকে বলে 'সমর্থা'। শ্রীকৃষ্ণের সখীদের অন্যতম চন্দ্রাবলী ও রাধিকা। এদের দু'জনের মধ্যে রাধার প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি 'মহাভাবস্বরূপিণী'। তাই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা-শ্রীরাধিকা এবং প্রতিনায়িকা – চন্দ্রাবলী। এই দু'জন নায়িকার একজন রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী, অন্যজন গোবর্ধনের স্ত্রী চন্দ্রাবলী। লৌকিক বিচারে তারা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা। যদিও রসসাস্ত্রে এই পরকীয়া লৌকিক পরকীয়া না,তাদের সম্পর্ক এখানে ভক্ত-ভগবানের তাই সেখানে লৌকিক সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য শাস্ত্রমতে যাঁরা বিবাহিত না হয়েও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তা, তাঁরাই পরকীয়া। জীব মায়াময় সংসারের জালে আবদ্ধ থাকে বলে জগতের প্রাণপুরুষ স্বকীয়া ভগবানের কাছে তারা পরকীয়া। ভগবানের ডাকে সাড়া দিতে হলে সংসারের বন্ধনকে তুচ্ছ করে বের হতে হয়। এটাই পরকীয়ার অভিসার। পরকীয়া ভাব দু'রকমের (১) কন্যাকা ও (২) পরৌঢ়া। যে মা গোপকন্যার অবিবাহিতা অবস্থায় প্রেম হয় তাদের কন্যাকা এবং যাদের বিবাহের পর সন্তানাদি হয় না অথচ তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয় তাদের বলে পরকীয়া। রাধিকার রাগাত্মিকা প্রীতি হল পরকীয়া স্বভাবের। নরোত্তম ঠাকুর 'খেতুরী'র মহোৎসবে লীলা কীর্তনের পালার সৃজন করেন। সেইগুলিকে পূর্বরাগ, অভিসার, প্রেমবৈচিত্ত্য, মাথুর, ভাবোল্লাস প্রভৃতি লীলায় ভাগ করা হয়। এছাড়াও আছে বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, মান, প্রভৃতি ধারার পদ এর সঙ্গে আছে অনুরাগ,কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি লীলা পর্যায়ের গান। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' ও শৃঙ্গার রসের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাব্যে আছে তেরোটি পালা। পদকর্তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের রচিত পদাবলীর মধ্যে নানা পালার গান দেখা যায়। এই সকল পদে রাধার ও তার সখীদের প্রেমের লীলার বৈচিত্র্য সঞ্চার হয়েছে।

বৈষ্ণব রসসাস্ত্রে বৈষ্ণবের পরিচয় প্রদর্শন করা হয়েছে এইভাবে –'বিষ্ণু দেবতা যার' বা বিষ্ণু যাদের উপাস্য তারাই হলেন বৈষ্ণব।[১] কিন্তু বাস্তবে পরিবর্তিত ভাবেই বৈষ্ণব শব্দটির অর্থকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষ্ণ-বাসুদেব রূপধারী বিষ্ণুর যারা উপাসনা করেন তারাই আদতে বৈষ্ণব হিসাবে বিবেচিত হন।কিন্তু অভিধান গত অর্থে যারা রাম –রুপী বিষ্ণুর ভক্ত তারাও বৈষ্ণব-নামের দাবিদার কিন্তু তাদের ভিন্ন পরিচিতি প্রধান করা হয়। বাংলা ভাষা –ভাষী মানুষেরা মোটামুটি যেহেতু পঞ্চদেবতার উপাসক, এই পঞ্চদেবতার অন্যতম হলেন বিষ্ণু ফলে যারা শাক্ত বা শৈব তারাও বিষ্ণুর উপাসক । দেবতার উপাসনার সুত্রেই ভক্তির প্রসঙ্গ চলে আসে বিভিন্নও সমালোচক বিভিন্ন ভাবে ভক্তিকে পরিচিতি প্রদান করেছেন।আরাধ্যের প্রতি যে অনুরাগ ,তাকেই বলা হয় ভক্তি।[২] এই ভক্তি আবার দুই রকম হৈতুকী এবং অহৈতুকী।কোন কিছুর প্রত্যাশায় ভগবানের ভজনাকে বলে হৈতুকী ভক্তি।আর বিনা প্রত্যাশায় ভগবানের ভজনাকে বলে অহৈতুকী ভক্তি।কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য চরিতামৃত এ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বর্ণনা করা ভক্তির স্তর বিন্যাসকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন।কবিরাজের ব্যাখ্যায় কোন ভাগ্যে যদি জীবের শ্রদ্ধা জন্মায় তবে তিনি সাধুসঙ্গ করেন। সাধুসঙ্গ থেকে কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও কীর্তন হয়। একে বলা হয় সাধনভক্তি। এতে সমস্ত পাপনাশ হয়।ফলে ভক্তি জন্মায়।ভক্তি থেকে নিষ্ঠা ,নিষ্ঠা থেকে নাম শ্রবণের রুচি জন্মায় ,কৃষ্ণে আসক্তি জন্মায়। এই ভাব গাঢ় হলেই তাকে বলা হয় প্রেম।[৩] উপরিউক্ত দুটি ভাবের ভক্তি ছাড়া আরও দুটি ভক্তি মার্গের কথা শ্রীরূপ গোস্বামী পঞ্চম লহরীতে বর্ণনা করেছেন যেগুলি হল বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। অন্যদিকে নায়িকার পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দুই ধরনের নায়িকার কথা বলা হয়েছে। যে সমস্ত নায়িকার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তারা হলেন স্বকীয়া নায়িকা, আর গোপীরা হলেন পরকীয়া। এই দুই প্রকার নায়িকার আবার বেশ কিছু ভাগ ও উপভাগ রয়েছে। অনেক মুসলমান কবিরা মধ্যযুগে বিশেষত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'বৈষ্ণব কবিতা' রচনা করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সেতু রচনা করেন। এরা কেউই স্বধর্ম ত্যাগ করেননি অথচ রাধাকৃষ্ণ প্রণয় লীলার ও চৈতন্য বিষয়ক পদ রচনা করে হিন্দু সংস্কৃতির চেতনায় সমৃদ্ধি লাভ করেন। এই সকল কবিরা হলেন আলী রাজা, সৈয়দ মর্তুজা, নাসির মাহমুদ, ইরফান, লাল মাহমুদ প্রমুখ কবি যারা কেউ বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন কেউ শাক্ত পদ রচনা করেছেন কেউ বা হরির পদ আশ্রয় করেছেন। যেমন সেই প্রসিদ্ধ উক্তি-'এবার লাল মামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে...'। অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের মধ্যে তাঁদের নিজেদের অধ্যাত্ম প্রেরণার উৎস খুঁজে পেয়েছেন। অনেক কবি যারা ধর্মে মুসলমান তারা বৈষ্ণব মনোভাব প্রকাশ করেছেন। অনেকে চৈতন্য ভক্তরূপে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আকবর, লালন ফকির, হুসেনের নাম করা যায়। দৌলত কাজী ও আলাওল একদিকে যেমন প্রেমাখ্যান মুলক কাব্য লিখেছেন, সেই সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। এইসব পদে রাধার পরকীয়া তত্ত্বের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে।

আধুনিক যুগে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা সাহিত্যে পরকীয়া প্রেমের পথ চলা 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক আখ্যান দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম' 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চ' প্রভৃতি উপন্যাসে নারী হৃদয়ের দুটি রূপের প্রেম ও পরকীয়া তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' এবং 'শ্রীকান্ত' নামক শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজবিরোধী নিষিদ্ধ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই নিষিদ্ধ প্রেমের পরকীয়ায় আছে পরকীয়া তত্ত্বের আভাস।

ধারাবাহিকতার সূত্রে শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্করের উপন্যাস সাহিত্যের উল্লেখ করতে হয়। তারাশঙ্করের রচনায় এই সকল ভক্তি ভাব প্রেমের প্রতিরূপ চরিত্রগুলির নানা মানসিক অবস্থা ঈশ্বরের অনুভব অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে কথাসাহিত্যিক উপস্থাপন করতে পেরেছেন। তারাশঙ্করের গল্প -উপন্যাসের অনেক জায়গায় বীরভূমের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব প্রেম সাধনা আশ্রিত হয়েছে, সেকথা অস্বীকার করা যাবে না। বীরভূম বৈষ্ণব বাউলের লীলাক্ষেত্র, আবার শাক্ততন্ত্রের পীঠভূমি। এখানকার বৈষ্ণব-বাউল ও শাক্ততন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব তারাশঙ্করের উপর পড়েছে এমন অনেক কাহিনী নিয়ে তিনি গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। যে গল্পগুলির মধ্যে হৃদয়গ্রাহী বৈষ্ণব ভাবধারার প্রবাহ অব্যাহত সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম আসে 'রসকলি'র নাম। 'রসকলি' গল্পটি নানা কারণে পাঠকচিত্তে কৌতূহল সৃষ্টি করে। এই গল্পটির সম্পর্কে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন- "ইহাতে বৈরাগী জীবনের সরস উচ্ছলতা ও প্রণয় ব্যাপারে স্বাধীনতা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। মঞ্জরী ও গোপিনীর প্রণয়--প্রতিযোগিতা ও কথা-কাটাকাটি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় খর হইলেও ইহা তাহাদের হৃদয়ের বেগবান ঘাত-প্রতিঘাতের যোগ্য বহিঃপ্রকাশ। শেষ- পর্যন্ত মঞ্জুরীর উদার আত্মত্যাগে পুলিন ও গোপিণীর দাম্পত্য সম্পর্ক গ্রন্থিমুক্ত হইয়াছে। এই প্রথম রচনাটি লেখকের শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেয় ও ইহাতে লেখকের ‘রাইকমল’ উপন্যাসের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।”[৪] মঞ্জরী শেষ পর্যন্ত বুঝেছে পুলিন গোপিনীতেই আত্মমগ্ন হয়েছে, মঞ্জরীর প্রতি পুলিনের যে আসক্তি ছিল তা বিগত। সেই উদার ত্যাগ স্বীকার তাকে মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

তারাশঙ্করের এই জাতীয় দ্বিতীয় গল্প 'প্রাসাদমালা'। 'প্রাসাদমালা' গল্পে আছে গ্রাম্য জীবনের একটি চলচ্চিত্র। গোপাল ও ললিতার বিবাহিত বাল্য প্রণয়ে বিচ্ছেদ এসেছে। গোপাল কীর্তনরসে মগ্ন ও ললিতা কলকাতার বড়লোকের দাসী হিসাবে বিকৃত বড়মানষী চালের ছোঁয়ায় অশুচি। তাই গোপাল ও ললিতার পুনরায় মিলন স্থায়ী হয়নি। গোপাল কীর্তন গানের বিরহ-পালার মধ্য দিয়ে তার অন্তর্বেদনার মুক্তি দিয়েছে। ললিতা তার জীবনের অশুচিতার পাপের পাঁক থেকে উঠে এসে নিজের চিত্তকে বিশুদ্ধ করেছে। তখন দুজনের মিলন সুখের হয়েছে এবং গোপাল বিরহ থেকে মিলনের পালায় নিজের কীর্তন পালাকে ভাবসাধনায় নিয়োজিত করেছে। এই গল্প প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়-"পল্লী গ্রামে যাহার উদ্ভব, বৈষ্ণব প্রেমবাসিত কল্পলোকে তাহার পরিসমাপ্তি। তবে বাস্তব গ্রামজীবন হইতে ভাববৃন্দাবনের তীর্থযাত্রার পথটি না লেখক না পাঠক কাহারও নিকট সুচিন্তিত হইয়া উঠে নাই। বাস্তবতা লাঞ্ছিত হইতে ভাবসুরভিত পরিবেশে প্রয়াণটি লেখকের কল্পনা বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াছে।"[৫]

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের সঙ্গে তারাশঙ্করের ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-"বঙ্কিমের কল্পনা মূলে ছিল 'নৈতিক মানুষ', রবীন্দ্রনাথের জীবন স্বপ্নে ধরা পড়েছে সুন্দরের লীলা। তিনি আবিষ্কার করেন 'রসিক মানুষ'কে। শরৎচন্দ্রের কল্পনা মূলে আছে 'প্রেমিক মানুষ'। তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই অখণ্ড মানবজীবনই স্বমহিমায় প্রকাশিত। এই কারণেই তাঁর হাতে কোমলে কঠোরে বিচিত্র রস পরিবেশন সম্ভব হয়েছে। শরৎচন্দ্র কেবল কোমল, কেবল মধুর। জীবনের রসতীর্থে তিনি বৈষ্ণবপন্থী। তাই বাৎসল্য ও মধুর রসই তাঁর সাহিত্যের মুখ্য রস ।... শরৎচন্দ্রের জীবনে রাধিকা মূর্তিরই আরাধনায় তারাশঙ্করের আরাধ্য জীবনের নগ্নিকা কালিকামূর্তি।"[৬] কিন্তু তাঁর সাহিত্যে 'নগ্নিকা কালিকামূর্তির' সঙ্গে কোমল হৃদয়বৃত্তির রাধিকামূর্তির আরাধনাও লক্ষ্য করা যায় । 'বেদেনি' গল্পের নায়িকার নামও রাধিকা এবং নায়কের নামও ‘কৃষ্ণ’ বা 'কিষ্ট'। সেখানে প্রেমের কোন সংস্কার, কোন প্রথা, কোন বাধা-বন্ধন নেই; অতীতের জন্যে নেই কোন ব্যথা, ক্ষোভ, ভবিষ্যতের জন্যে নেই কোন দুরাশা, কেবল উন্মুক্ত জীবনস্রোত বর্তমান, তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আবেগে উল্লসিত স্বচ্ছন্দ নৃত্যগতিতে এগিয়ে চলার সহজিয়া আনন্দেই চঞ্চল-তারই কথা আছে ‘বেদেনিতে’। বেদের মেয়ে রাধিকা সে যেন মদিরার

সমুদ্রে স্নান করে উঠেছে। মাদকতা তার সারা শরীর বেয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। কৈশোরে এক বেদের ছেলের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছিল। যৌবনের তীব্র দাবদাহে সে বারবার প্রেমের আধার পরিবর্তন করেছে। যা বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে পরকীয়া প্রেমের পরিচিতি লাভ করেছে। যে প্রেমকে পূর্ণতা দেবার জন্য রাধিকার পূর্ববর্তী স্বামীকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে হাত কাঁপে না।

‘রাইকমল’ উপন্যাসের ভূমিকা প্রসঙ্গে যেখানে লেখক নিজে বলেছেন,যেটি তিনি উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, ‘বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র রাঢ়দেশের কেন্দুবিল্ব এবং নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অজয়ের তীরভূমির কিছু পরিচয় প্রয়োজন বোধে যোগ করিয়া দিলাম। চালচিত্র না হইলে প্রতিমা মানায় না ;স্থান ও কালের পটভূমি উপযোগী না হইলে পাত্র-পাত্রীর পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না পাঠকেরও বুঝিতে কষ্ট হয়।’[৭] তারাশঙ্করের পাঠক মাত্রই জানেন, তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'রসকলি'তে তাঁর রাইকমল উপন্যাসের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। লেখকের জমিদারিত্বের অধীন এক গ্রামে এক বৈষ্ণব আখড়া ছিল। সেই আখড়ার সঙ্গে তারাশঙ্করের যোগাযোগও ছিল। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ 'রাইকমল' উপন্যাসে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সমাজের রূপ-বৈচিত্র্যের একটা সার্থক নিদর্শন এই চিত্রের মধ্যে ধরা পড়ে। এর 'অসামাজিক স্বাধীনতার ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে হিন্দু সমাজের রুদ্ধ ঘরে দখিনা বাতাসের স্পর্শ কিছুটা স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি হতে পারে। বৈষ্ণবের স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলা, সঙ্গীত প্রভৃতি ললিত কথায় অনুরাগ ও নৈপুণ্য, স্বভাবের উদারতা ও মাধুর্য ও কখনো কখনো মহাপ্রভুর ধর্মের অনুপ্রেরণায় প্রকৃত চরিত্র গৌরব-হিন্দুর বৈচিত্রহীন গতানুগতিকতার মধ্যে ফিরে আসে যা কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের কারন হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটুকু বাস্তব অনুসারী বলে উপন্যাসিকের কাছে তা উপজীব্য হবার উপযোগী। কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ঠিক মাত্রা বজায় রাখতে পারেন নি। তাঁর রাইকমলের স্বপ্নবিভোর তন্ময়তা তার প্রণয়াবেশের পার্থিব স্তর থেকে অপার্থিব স্তরে উন্নতি সাধারণ বৈষ্ণবের অনুভূতির অনেক উপরে। রসিক দাসের সঙ্গে রাইকমলের মালা বদলের ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও, এই ব্যাপারে রসিক দাসের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সুন্দরভাবে উপন্যাসিক পরিবেসন করেছেন। আসক্তি ও বৈরাগ্য, পার্থিব ও ঐশী প্রেমের অবিরত টানাপোরেনে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । 'যদিও আত্মগ্লানি রসিক দাসেরই বেশি ও বন্ধনচ্ছেদের প্রথম প্রেরণা তার দিক থেকেই এসেছে। নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত, আচরণ, কথোপকথন ও হাস্য-পরিহাস সমস্তই বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা। পদাবলীর কলির খণ্ডাংশ তাদের কথাবার্তার মধ্যে সুরভি নিঃশ্বাস বায়ুর মতো আসা-যাওয়া করেছে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে খেদ ও ক্ষোভের সঙ্গে যে সূক্ষ্ম, সুকুমার সুষমা জড়িয়ে আছে, তা সাধারণ বৈষ্ণবের নাগালের বাইরে। বৈষ্ণব ধর্মের গভীর অধ্যাত্ম সাধনার এই বিকাশ বাস্তব জীবনের প্রতিবেশে, সাধারণ স্তরের নরনারীর চরিত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমি মনে হয়।

'কবি' উপন্যাসটি শুধু তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়, এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সম্পদ। 'কবি'র নায়ক নিতাই জাতিতে ডোম। কিন্তু সে গোবরে ফোঁটা পদ্মফুলের সুগন্ধ নিয়ে আপন কবিত্বের অধিকারী হয়েছে। সাতপুরুষে নিতাইয়ের বংশে সবাই চোরদের চর, ডাকাত, রাহাজানি, লুঠপাট, লেঠেলগিরিতে সবাই ওস্তাদ। কিন্তু কিভাবে কি হয়ে গেল-নিতাই একদিন স্বভাব কবিত্বে কবির দলে নাম লেখাল। গ্রামের জমিদারবাবুরা তার গান শুনে তাকে বাহবা দিল। সে ডাকাতি ও সমস্ত রকম বদ স্বভাব ত্যাগ করে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধারায় জীবনের মোড় ফেরাল। যদিও তার জীবনের নিত্যসঙ্গী বসন, ললিতা, নির্মলা, মাসী ও পুরুষসঙ্গীরা যারা জীবনের অনুসঙ্গে পৃথক এক ভিন্ন রসের আস্বাদনে মত্ত, তবু সেই ব্যাভিচারী জীবনরসের মধ্যেই কিছু পরিমাণে বন্ধনহীন আনন্দ ও স্নেহ-মায়া-মমতার মিশ্রণে অদ্ভুত রসের আস্বাদন দিয়েছে। লেখক বাংলা শিক্ষা, সংস্কৃতি, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কথার প্রভাবজাত সমাজ জীবনের নিম্নতম স্তর থেকে উঠে আসা কবিয়াল নিতাইয়ের প্রাণোজ্জ্বল জীবন কাহিনীকে অদ্ভুত ও মাধুর্যপূর্ণ আস্বাদন দিয়েছেন। গভীর সৌন্দর্যবোধ ও সরসতা

সৃষ্টি করেছেন। বাংলার কবিয়াল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সবের প্রাণমাতানো সুরের অনুরণন দেখা যায়। কবিয়াল নিতাই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কথার অন্তরালের বার্তা পৌঁছে দেয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমানসে। নিতাই সেদিক থেকে গণশিক্ষক। কিন্তু তার জীবনে গ্লানিও আছে। তাকে ভোগ করতে হয় ঝুমুর দলের অশিক্ষিতা গায়িকাদের বিড়াম্বনা জীবনের বেদনাকে। বসনের চরিত্রে তীক্ষ্ণতা, হিংস্র আঘাত করার প্রবৃত্তি ও উদ্দাম। বেপরোয়া জীবনের আঘাত সহ্য করতে হয়। অন্যদিকে ঠাকুরঝির মধুর, অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগের প্রেমের রোমান্স তাকে অধীর চঞ্চল ও প্রণয়াবেগে অস্থির করে তোলে। এইভাবে অসুন্দর জীবনে সুন্দরের আরাধনার রূপটি সার্থক হয়ে ওঠে। এই সুন্দরে কুৎসিত মিশ্রিত হয়ে আশ্চর্য জীবনরসের এক সার্থক রূপ ফুটে উঠেছে 'কবি' উপন্যাসে নিতাই চরিত্রে। এ সম্পর্কে বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-"এই উপন্যাসে লেখক বোধহয় সর্বপ্রথম প্রেমের বৈদ্যুতিক শক্তি অনুভব করিয়াছেন। ঠাকুরঝি ও নিতাই-এর মধ্যে সম্বন্ধটি একটি মধুর, অপরিস্ফুট হৃদয়া বেগের রহস্যমণ্ডিত; প্রেমিকের কল্পনায় তাহার চলমান মূর্তিটি যে স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ কালকুলের রূপক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে তাতেই এই সম্বন্ধের কাব্য মাধুর্যের দ্যোতক। বসন্তের ভালবাসায় তীক্ষ্ণতর স্বাদবৈচিত্র্য অনুভূত হয়। নিতাইয়ের চরিত্রে তাহার হীনজাতি ও বিনয়কুণ্ঠ আচরণের মধ্য দিয়া চরিত্র গৌরব এবং কবির মানস আভিজাত্য ও অতৃপ্তি চমৎকার ফুটিয়াছে।"[৮].....এদের কাছে নিতাই একটি কথা উপন্যাসে বলেছে- যা প্রবাদ রূপে গ্রহণীয় হয়েছে এই জীবন ক্ষুদ্র, এর স্বাদ বৈচিত্র্য অনন্ত। 'এ জীবন ছোট কেন?' এই উক্তিতে নিতাইয়ের জীবন সংবেদনার অপরূপ সুরমূর্ছনা ধরা পড়ে। নিতাই-এর এই অব্যক্ত প্রেম বাসনাকেই বৈষ্ণবীয় পরকীয়া তত্ত্বের সামিল বলে মনে হয়।

তারাশঙ্কর তাঁর 'রাধা' উপন্যাসে ধর্মতত্ত্বমূলক মতবাদ সংঘর্ষের কাহিনীকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। 'রাধা' লেখকের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে হলেও সমালোচক একে রাজনৈতিক ঘটনামূলক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেশকালের ইতিহাস বলতে চাননি। একে ধর্মমূলক উপন্যাস বলতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে ধর্মই মুখ্য, রাজনীতি গৌণ। উপন্যাসের নায়ক মাধবানন্দ মনে করেন বৈষ্ণব ধর্মে রাধাতত্ত্ব-পরকীয়া সাধনা একটি বিকার মাত্র। এই বিকারের বিরুদ্ধে তিনি বিশুদ্ধ মতবাদের প্রবর্তন করতে চান। ধর্ম সাধনার এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তার এই ক্ষাত্র শক্তির আশ্রয়ের মূলে আছে আত্মরক্ষার তাগিদ।

মাধবানন্দ কৃষ্ণতত্ত্ব থেকে রাধাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে প্রয়াসী। কারণ তিনি জানেন, বৈষ্ণব সমাজ রাধা প্রেমকে গ্রহণ করে কৃত্রিম ভালবাসা ভাববিলাস ও পরকীয়া সাধনার জন্য বিকারপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই রাধার প্রতি মাধবানন্দের তীব্র বিরোধিতা। 'কৃষ্ণদাসী ও তার মেয়ে কিশোরী মোহিনীর সংস্পর্শেই এই বিরোধের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে। বৈষ্ণব সিদ্ধ পীঠের মালিক কৃষ্ণদাসী এবং ইলামবাজারের বড় ব্যবসায়ী রাধারমন দাস সরকারের 'সাধনসঙ্গিনী'। সে ও তার কন্যা মোহিনী মানবানন্দের রূপে মুগ্ধ, মোহাবিষ্ট এবং তাদের ভক্তি নিবেদনে দেহ কামনার ইঙ্গিত তাঁকে টানে। এই দেহ কামনার চিরকালীন ধর্মসংস্কার দেহসমর্পণের আমন্ত্রণের মধ্যে তারা একে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যেই বিবেচনা করে, তাতে কোনো দোষ দেখা যায় না। কিন্তু মাধবানন্দের তীব্র প্রত্যাখ্যানে তারা কিছুটা অবাকই হয়ে যায়। মাধবানন্দ মা ও মেয়ের এই আচরণে কিছুটা ঘৃণাবোধ করে।

মাধবানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রধান শিষ্য কেশবানন্দের মতবিরোধ ঘটেছে ধর্মসাধনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার ঔচিত্য নিয়ে। মাধবানন্দ চান ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন সংশ্রব না রাখতে। তিনি ধর্ম ও সামাজিক চিত্তের শুদ্ধি ও ভগবানের বিশুদ্ধ স্বরূপ অনুভূতির সাহায্য চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিষ্য কেশবানন্দের প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে এবং ঘটনাচক্রে ধীরে ধীরে হার স্বীকার করে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। লালসাযুক্ত দাস-সরকার ও বর্গীর হাঙ্গামার কবলমুক্ত করার জন্য কৃষ্ণদাসী ও মোহিনীর উদ্ধারমানসে তাঁকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে এবং রাজনীতির জটিল পাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তাই

কংসারির উপানসা এবং সংহারের দেবতা রুদ্রের আরাধনার সঙ্গে তাঁর ধর্ম-সাধনাকে মিশ্রিত করতে হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত মোহিনীকে দাস-সরকারের বাড়ি থেকে উদ্ধার করবার জন্য তাঁকে ডাকাতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। মোহিনী শেষবার তাঁর কাছে আত্মনিবেদনের বিনিময়ে মাধবানন্দের রূঢ় প্রত্যাখ্যান লাভ করেছে এবং চিরতরে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করেছে। এরপর নবাব সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে মাধবানন্দের সংজ্ঞাহীনতায় অসুস্থ জীবনে মোহিনীর সেবা-শুশ্রুষায় স্নেহ-পরিচর্যায় তিনি আবার সংজ্ঞা ও জীবন ফিরে পান। ফলে মাধবানন্দ তার আগের সমস্ত ধ্যান ধারনা পূর্ব বিদ্বেষ ও তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে তিনি রাধাতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েছেন। প্রেমের এই দ্বৈতস্বরূপে তাঁর বিশ্বাস ফিরেছে। তাঁরা যুগল সাধনার শাশ্বত আদর্শের কাছে মাথা নুইয়েছে। কেন্দুলির মোহান্তের জয়দেবের ধর্মসাধনা প্রণালী, আনন্দচাঁদ গোস্বামীর তন্ত্র ও বৈষ্ণব আদর্শে সাংসারিক বৈরাগ্যে প্রশ্রয় ও নির্লিপ্ততায় মেশানো, কৃষ্ণদাসী ও তার শ্বশুর প্রেমদাস বাবাজীর লৌকিক বৈষ্ণবতার বিকার ও ডাকিনী-সিদ্ধির পিছনে কিছুটা সত্য আচারনিষ্ঠা ও ভক্তি বিহ্বলতার স্পর্শ, মাধবানন্দের পূর্ব জীবনের ইতিহাসে তাঁর রাধাবিদ্বেষের প্রেরণা এবং রাধাতত্ত্বের পুনরুদ্ধারে শেষ জীবনের মোহিনীর সেবাশ্রয়ী ভালবাসার ভিতর বাঙালির ধর্মসাধনার এক অপূর্ব তথ্যপূর্ণ তত্ত্বানুভূতিময়, বিচিত্র বিবরণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে লেখকের গভীর জীবন উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “'রাধা' উপন্যাসটি সাধনা রহস্যের অপরূপ কাব্যময় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ। এই সাধনা-প্রেমসাধনা-রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া তত্ত্বের ফলিত রূপ বলা যায়। প্রথমে এই রাধা উপন্যাসটি পড়ে বৈষ্ণবকুলতিলক হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন এর বিরূপ সমালোচনা করেন এবং উত্তপ্ত হয়ে যান। পরে মাধবানন্দের দ্বৈত প্রেমসাধনার আরতি দেখে কিছুটা শান্ত হন। এই উপন্যাসের মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালীর ধর্মীয় বিবরণে বাংলার ধর্মচেতনার আশ্চর্য ইতিহাস রচিত হয়েছে।”[৯] তাই এই আলোচনার যবনিকা পতনের আগে বলতেই হয় বাংলা সাহিত্যের সূচনা লগ্ন শুধু নয় বাংলা সাহিত্যের সূচনার জন্য যে সকল সাহিত্যিক নিদর্শন গুলিকে পূর্বসূরি বলে মনে করা হয়,সেগুলিতে কোন না কোন ভাবে ধর্ম সংযোজিত ছিল ।পরবর্তী সময়ে এই ধর্মকে অবলম্বন করে আবার একটি বিশেষ সম্প্রদায় গড়ে উঠে যারা ধর্মকে অবলম্বন করলেও শেষ পর্যন্ত তা বাংলা সাহিত্যের সম্পদকেই সমৃদ্ধ করেছে।তা অস্বীকার করার কোন অবকাস নেই।আর তারাশঙ্কর তাঁর পূর্বসূরিদের অনুকরন করেছেন যা বাংলা সাহিত্যের সম্পদকে সমৃদ্ধ করেছে। এবং তা উপন্যাসিকের মানস প্রকৃতির উন্মোচন করেছে।

তথ্য সূত্র—

১ শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বৈষ্ণব পদাবলী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পৃষ্ঠা – ১৯ জুলাই ২০০৮।

২ শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বৈষ্ণব পদাবলী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পৃষ্ঠা –৩৮ জুলাই ২০০৮।

৩ ড. সত্য গিরি বৈষ্ণব পদাবলী ডিসেম্বর ২০০৬ পৃষ্ঠা ৬৬

৪ ৫ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ২৯২" ২০১৮-২০১৯ ।

৫ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা ২৯৩ , ২০১৮-২০১৯ ।

৬ ড. নিতাই বসু, তারাশঙ্করের শিল্পীমানস , পৃষ্ঠা ৪২ , অক্টোবর ২০১৫

৭ ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ , বিচিত্র তারাশঙ্কর , পৃষ্ঠা ১৯১ , ডিসেম্বর ২০১১ ।

৮ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা ২৯৮-২৯৯ ২০১৮-২০১৯

৯ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা ৩১৮, পুনমুদ্রন ২০১৮-২০১৯ পৃষ্ঠা ৩১৮

সহায়ক গ্রন্থ

১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ বিচিত্র তারাশঙ্কর, ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ।

৩ তারাশঙ্করের শিল্পীমানস, ড. নিতাই বসু।

৪ বৈষ্ণব পদাবলী, ড. সত্য গিরি।

৫ বৈষ্ণব পদাবলী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ।

৬. আদিত্য মুখোপাধ্যায় ‘তারাশঙ্করঃ সময় ও সমাজ’।

৭ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা [দুই খণ্ড]।

৮ মহীতোষ বিশ্বাস, বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ ; আঞ্চলিকতা।

৯. রঞ্জিতকুমার মুখার্জি, তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা

১০ . দেশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫

১১. মিত্র ও ঘোষ সম্পাদিত আকর গ্রন্থ তারাশঙ্কর রচনাবলী, [১-২৪ খণ্ড]

১২ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা

১৩ ড. নিতাই বসু, তারাশঙ্করের শিল্পীমানস, দে’জ পাবলিসিং, কলকাতা

১৪. উজ্জল কুমার মজুমদার, ‘তারাশঙ্করঃ দেশ কাল সাহিত্য’

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.